বিনয় বাদল দিনেশ

জ্ঞানভিক্ষু

বিনয়-বাদল-দীনেশ

২৩০

জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র
কলিকাতা—৭০০০৭৩

বিনয়-বাদল-দীনেশ

বহুদিনের পরিচিত ডালহাউসী স্কোয়ারের নাম পাল্টে বর্তমান সরকার কেন এর নাম রাখলেন বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ, এ বিষয়ে কিছু বলা হবে এই গল্পে।

এখন হতে কয়েক শো বছর আগের কথা। ইংরেজরা আমাদের দেশে এসেছিল বাণিজ্য করার জন্য। তারা এসেছিল সাগর পথে। তখনকার সময়ের ভারতের মুসলমান সম্রাট তাদের বাণিজ্য করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কে জানত—ঐ বণিকের দলই একদিন ভারতের শাসক অর্থাৎ কোটি কোটি লোকের দণ্ড-মুণ্ডের অধিকারী হবে? শুধু কি তাই, তারা চালাবে এই দেশবাসীর উপর অসহনীয় অত্যাচার? আর

এই দেশেরই ধন-দৌলত ও নানাপ্রকার অতি দরকারী সামগ্রী নিজের দেশে নিয়ে হবে বড়লোক, আর এ দেশবাসীরা ভুগবে রোগে, শোকে, অনাহারে আর পরাধীনতার জ্বালায়।

যা হোক, যে ভুল দেশবাসী করেছিল সরল বিশ্বাসে তার জন্য তাদের দিতে হয়েছিল বুকের রক্ত। বহু বীর সন্তানই ঐ অত্যাচারী নিষ্ঠুর ইংরেজ শাসকদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন, ভারতমাতাকে ঐ বিদেশী শাসকদের নাগপাশ হতে মুক্ত করার জন্য। যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁরা নিজেকে তুচ্ছ মনে করতেন। দেশের স্বাধীনতা ও সকলের ওপর দেশকে অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলেন। তাঁরা আজ শহীদ দেশের জন্য। আমাদের পূজার যোগ্য, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীন, সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এরূপ আরও অনেক শহীদই মরণকে হাসিমুখে

বরণ করেছেন। বিনয়কৃষ্ণ বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত এঁদেরই মত দুঃসাহসী, বিপ্লবী নায়ক। এঁরা জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করতে পেরেছিলেন। এঁদের সাহস ভয় পাইয়ে দিয়েছিল দুর্ধর্ষ, অত্যাচারী, নির্দয় ইংরেজ শাসকদের।

আগে মহাকরণের নাম ছিল রাইটার্স বিল্ডিংস্ আর জায়গাটার নাম ছিল ডালহাউসী স্কোয়ার। ইংরেজ বড়লাট ডালহাউসীর নামেই এই জায়গাটার নাম হয়েছিল ডালহাউসী স্কোয়ার। রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ বিনয়-বাদল-দীনেশ যে সাহস আর দেশের প্রতি ভালবাসা দেখিয়ে শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে ডালহাউসী স্কোয়ারের নাম রাখা হয়েছে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ। এবার বিনয়, বাদল ও দীনেশের বীরত্বের কথা বলি।

লণ্ডনে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে ইংরেজদের বুঝা-পড়ার জন্য গোলটেবিল বৈঠক আরম্ভ হল। ঠিক এই সময় বাংলা দেশে ঘটে গেল এক অবাক ঘটনা। মাত্র বাইশ বছরের যুবক। নাম বিনয়কৃষ্ণ বসু। হঠাৎ শোনা গেল, বঙ্গমাতার এই নির্ভীক সন্তান ঢাকায় পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ লোম্যানকে ও পুলিশ সুপার মিঃ হাডসনকে গুলি করে একজনকে পাঠিয়েছেন পরলোকে আর অপরজনকে করেছেন আহত। নিরীহ দেশবাসীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিলেন পুলিশের এই বড় কর্তারা। অপরাধ তাঁদের ছিল অমার্জনীয়। দেশবাসীদের ওপর অত্যাচার এই দেশপ্রেমী যুবকের হৃদয়ে যে আঘাত দিয়েছিল তারই প্রতিশোধ নিয়েছিলেন তিনি গুলির জবাবে। তাই সেদিন তেজবাহাদুর বলেছিলেন—

"বিনয় বসু গোলটেবিল বৈঠকের কাজ অনেকটা

এগিয়ে দিলেন"। ইংরেজরা বুঝেছিলেন, ভারতীয়দের যত ভীরু মনে করেন তত ভীরু ভারতীয়রা নন। এছাড়া দেশমাতাকে বিদেশীর হাত হতে মুক্ত করতে তাঁরা জীবন দিতে ভয় পাবেন না এবং অত্যাচারী ইংরেজ শাসকের পুলিশের গুলিকে তাঁরা থোড়াই পরোয়া করেন। যা হোক, বীর, বিনয়ের জীবন-নাটকের এক অঙ্কের অভিনয় শেষ হল। কিন্তু পুলিশ তাঁর পিছু নিল।

লোম্যান মারা যাওয়ায় পুলিশ উঠেপড়ে লাগল বিনয় বোসকে ধরবার জন্য। কিন্তু কোথায় বিনয় বোস, সেই হদিশ দেবে কে? বুকভরা সাহস আর হাসিভরা মুখের সেই ছেলেটি তখন পুলিশের কড়া পাহারা এড়িয়ে ঢাকারই আর এক বিপ্লবী মণি সেনের বাড়ীতে হয়েছেন হাজির। মণি সেনের তখন খুব ভাবনা। তিনি ভাবছিলেন—কেমন করে বাংলা

মায়ের দামাল ছেলেকে নিরাপদ কোন জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া যায়। কারণ পুলিশ যে রকম পেছনে লেগেছে তাতে ঢাকায় তো বিনয়কে বেশী দিন রাখা যাবে না।

বিনয়ের কিন্তু চোখে-মুখে চিন্তার কোন ছাপ ছিল না। রাত্রিবেলা গভীর ঘুমে তিনি থাকতেন অচেতন আর দিনের বেলা সব সময়ই থাকতেন হাসিখুশি। শুধু একটা জিনিস তাঁর ভাল লাগতো না—শুয়ে-বসে দিন কাটাতে। তাঁর ইচ্ছে হত ছুটে বেড়িয়ে আরও শত অত্যাচারী ইংরেজকে চরম শিক্ষা দিতে।

তারপর একদিন বেরিয়ে পড়লেন তিনি। সারা বাংলা দেশে তখন দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে

তাঁর ছবি—ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁকে ধরে দিতে পারলে নগদ অনেক টাকা দেওয়া হবে। বিনয় জানেন সব, বোঝেন বিপদ তাঁর মাথার ওপর ঝুলছে। তবু অসীম সাহসে ছেঁড়া লুঙ্গী আর ময়লা গেঞ্জী পরে মুসলমানের বেশে একদিন রওনা হলেন ঢাকার পরের রেল স্টেশন ফতুল্লার দিকে, ঠিক করলেন, কলকাতা যাবেন ঢাকা থেকে।

নারায়নগঞ্জ যাবার ট্রেন এলে তড়িঘড়ি করে ট্রেনের মধ্যে উঠে পড়লো অনেক পুলিশ। তারা খুঁজছিল বিনয়কে। তারা তন্ন তন্ন করে যখন ট্রেনের কামরাগুলো খুজছিল তখন স্টেশনের একটি বেঞ্চে বসে হাসতে হাসতে বিনয় সব দেখছিলেন। পুলিশরা ট্রেন থেকে নেমে গেলে আড়মোড়া ভেঙে উঠলেন বিনয়। শান্তভাবে গিয়ে বসলেন একটা কামরায়। পুলিশ জানতেই পারল না যে, যাকে

তারা খুঁজছে সেই বিনয় বোস তাদেরই পাশ দিয়ে ধীরে-সুস্থে হেঁটে গিয়ে উঠছে ট্রেনে।

ট্রেন ছাড়ল। এক বিপদ এলো। বিনয়ের কামরায় এক দারোগা উঠে পড়ল, আড়চোখে তাকে দেখেই কম্বলচাপা দিলেন বিনয়। দারোগা কামরায় উঠে নিজের মনেই গালাগালি করতে লাগলেন বিনয়কে। যখন চোখ পড়ল কম্বলচাপা লোকটির ওপর তখন জিজ্ঞাসা করলো—ওটা কে? বিনয়ের সঙ্গী বললেন—আমার সাথী। জ্বর হইছে, একদম বেহ‍ঁস, সংক্রামক জ্বর তো। তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন দারোগা—একে জ্বর তায় সংক্রামক! পরের স্টেশনেই কামরা বদলালেন তিনি। তিনি চলে যাবার পর মুখ থেকে কম্বলের ঢাকা সরালেন বিনয়। হাসিতে ভরে উঠল তাঁর মুখ। এইভাবে

একসময় কলকাতায় পৌঁছে গেলেন তিনি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে।

কলকাতায় এসে সাত নম্বর ওয়ালিউল্লা লেনে উঠলেন বিনয়, সে বাড়ীতে বাস করতো নানা জাতের লোক। সেখানে বার্মাদেশের লোকেরা যেমন পোশাক পরে সেইরকম লুঙ্গী আর পোশাক পরে থাকতে লাগলেন সে মানুষটি, কেউ ভাবতে পারেনি যে, তারই নাম লোম্যান হত্যাকারী বিনয় বসু।

কলকাতা থেকে তিনি গেলেন চুঁচুড়ায়, তাঁর সঙ্গী হলেন প্রবীণ নেতা হরিদাস দত্ত। সেখানে থাকতেন হরিদাসবাবুর ভাগিনীজামাই সরোজ রায়। সরোজ রায় ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটের কন্‌ফিডেনসিয়াল ক্লার্ক। পুলিশ যখন বিনয়কে ধরার জন্য চারপাশে

জাল পেতে অপেক্ষা করছিল তখন সমস্যা হল—কি করে বিনয়কে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। সমস্যার সমাধান করলেন সরোজবাবু। ম্যাজিস্ট্রেটের প্রাইভেট গাড়িতেই বিনয়কে নিয়ে বসলেন সরোজ রায়। পুলিশবাহিনী সেলাম করে গাড়ি ছেড়ে দিল। গদিতে হেলান দিয়ে হাসতে হাসতে সব দেখলেন তিনি।

চুঁচুড়াতেও পুলিশের উৎপাতে থাকা দায় হল। বিনয় আবার কলকাতায় চলে এলেন। এবার উঠলেন বেলেঘাটায় রাজেন গুহ-র বাড়ীতে। সেখানে বসে বিনয় শুনলেন—সবাই চাইছে তাঁকে ইউরোপে পাঠিয়ে দিতে। বেঁকে বসলেন, তিনি বললেন—ভারতের বাইরে? না, তা কেন যাব! আমি ইউরোপে যাব না, যাব রাইটার্সে। রাইটার্স

অভিযানে মারব সিম্পসন নামে সেই অত্যাচারী ইংরেজকে।

সবাই শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন বিনয়কে রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযানে পাঠাতে। বিনয় হলেন নেতা আর তাঁর সাথী হলেন বাদল আর দীনেশ।

হাল ছাড়লে চলবে না। জীবন-নাটকের অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামের তখনও অনেক অঙ্ক বাকি, তাই কলকাতা এসে দেখা করেন বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে। শ্রীঘোষ বৈপ্লবিক কার্য পরিচালনার জন্য একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। বিনয় এই সংগঠনের কর্মীদের সঙ্গে এসে হাত মিলালেন, তিনি তাঁর মনের মানুষ খুঁজে পেলেন এই দলে। একটি অতি দুঃসাহসীক মতলব আঁটলেন। ঠিক করলেন, বাংলার প্রশাসনিক

ভবন অর্থাৎ রাইটার্স বিল্ডিংস্ অভিযান করবেন। ঐ ভবনেই তখন বসতেন অত্যাচারী ইংরেজ শাসকের পুলিশের নিয়ামকরা। তৈরী হয়ে নিলেন বীর নায়ক তাঁর জীবন-নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের পালা শুরু করতে। সঙ্গে নিলেন দু'জন বীর সৈনিক। একজনের নাম বাদল গুপ্ত, বয়স মাত্র আঠারো বছর। অপরজন দীনেশ গুপ্ত, তিনিও মাত্র বিশ বছরের এক নির্ভীক যুবক। তিনজনে সঙ্গে নিলেন তিনটি ছোট রিভলবার (পিস্তল) আর নিলেন মনভরা সাহস এবং বুকভরা শত্রুজয়ের হিংসা, এই ছিল তাদের সেদিনের শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ের প্রধান সম্বল। এছাড়া অবশ্য একটি ছোট নক্সাও ছিল তাঁদের সঙ্গে। রাইটার্স বিল্ডিংসে সাহেব বড়কর্তাদের বসবার ঘর ছাড়াও অপরাপর ঘরগুলির কোনটি কোথায় তা ঐ নক্সায় দেখান

ছিল। এছাড়াও চিহ্নিত ছিল, বিভিন্ন তলায় ওঠানামার সিঁড়িগুলি অর্থাৎ অতি প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছুই ঐ নক্সায় আঁকা ছিল। কয়েকদিন আগে তাঁরা গোপনে গিয়ে ঐ ঘরগুলির অবস্থান নক্সার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন।

কাজেই অত্যাচারী শাসকদের পুলিশের বেয়নেট আর গুলি তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ। আর তাঁর সঙ্গে মিলেছেন নির্ভীক দীনেশ ও বাদল।

এখন হতে প্রায় ৫২ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বরের এক শীতের সকালের কথা। একটি ছোট্ট গাড়ি এসে থামল রাইটার্স বিল্ডিংসের সামনে। আর গাড়ি থেকে নেমে এলেন তিনজন যুবক। চোখ-মুখ উজ্জ্বল, মুখে তাদের বীরত্বের ছাপ। এতটুকু ভয়ের লেশ নেই। উদ্দেশ্য মহৎ। তাই হৃদয়ে ছিল অফুরন্ত সাহস। একথাও তাঁদের অজানা ছিল না যে লালবাজার

ছিল অত্যাচারী শাসকদের অত্যাচারের মূল যন্ত্র অর্থাৎ পুলিশ হেডকোয়ার্টার। কিন্তু লালবাজারের ভয় তাদের মনে এতটুকুও দাগ কাটতে পারেনি। আগের দিনে রাইটার্স বিল্ডিংস ঢোকা তো দূরের কথা অনেক লোক ভয়েই গেট হতে ফিরে যেত। কিন্তু এই তিনজন যুবক স্যুট প্যান্ট পরে গাড়ি থেকে নেমেই বিনা দ্বিধায় অতি পরিচিতের মত সোজা ঢুকে পড়লেন রাইটার্স বিল্ডিংসের ভেতরে। মাত্র বিশ দিন আগে ঢাকায় পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ লোম্যানকে পরলোকে পাঠিয়ে আর পুলিশ সুপারিণ্টেনডেন্ট মিঃ হাডসনকে আহত করে আসার জন্যে, বিনয়ের খোঁজে পুলিশ বিভাগের লোক যে ওত পেতে আছে, সেজন্য ঐ বীরের এতটুকু ভাবনা নেই। জীবন-নাটকের যে পাঠ তিনি নিয়েছেন সে পাঠ জীবনে অসমাপ্ত রাখবেন না—এই ছিল তাঁর পণ।

সিম্প্‌সন সাহেব ছিল সেই সময়কার ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ। সিম্প্‌সন সাহেব মহাকরণের দোতলায় একটি ঘরে বসতেন। কথিত আছে, তিনি কারাবিভাগেরও অধিকর্তা ছিলেন। বীর তিনজন ঠিক সেই ঘরের সামনে এসে হাজির হলেন। প্রহরী তাঁদের নাম ঠিকানা লিখে দেওয়ার জন্য টুকরো কাগজ দিল। তাঁরা চোখের ইশারায় কি বলে কাগজ টুকরো হাতে নিয়েই সোজা গিয়ে হাজির হলেন সিম্প্‌সন সাহেবের সামনে। মিঃ সিম্প্‌সন তখন টেবিলে বসে কাজ করছিলেন, আর মিত্র তাঁকে সাহায্য করছিলেন।

এই কুখ্যাত সাহেবই একদিন সুভাষ বোস ও যতীন্দ্রমোহনকে অকথ্য অত্যাচার করেছিলেন। নিপীড়ন করেছিলেন দিনের পর দিন স্বাধীনচেতা দেশবাসীর ওপর। সে কাহিনী বিনয়-বাদল-

দীনেশের অজানা নয়। একের পর এক তাঁরা আরও কয়েকটি ঘরে হানা দিলেন। ফলে লালমুখো কর্মচারীরা প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। বিচার-বিভাগীয় সেক্রেটারী মিঃ নেলসন, সেক্রেটারী টয়নাম প্রমুখ আই. সি. এস. অফিসারেরাও এই বীর নায়কদের রোষ হতে রেহাই পেলেন না। তাঁরাও প্রাণ ভয়ে চীৎকার করতে লাগলেন। সে এক ছোটখাট কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। আমেরিকান পাদ্রী মিঃ জনসন ডেন পাইপ বেয়ে অতিকষ্টে নীচে নেমে পড়ে কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচালেন। একথা ভাবলেও অবাক হতে হয় যে, প্রকাশ্য দিবালোকেই ডালহোউসী স্কোয়ারে সাহেবদের ঐ লালকেল্লায় এতবড় বিপদ নেমে আসবে, শুধু তিনজন অতি অল্প বয়সের যুবকই অঘটন ঘটাতে পারবে। এরপরই তাঁরা আক্রমণ করলেন পাশপোর্ট অফিস।

তাঁদের মনে পড়ল, স্বাধীনতাকামী দেশনেতা ও দেশবাসীর ওপর ঐ লালমুখো শয়তানের অতি নির্দয় অত্যাচারের কথা।

পুলিশ ইন্সপেক্টর সিম্প্‌সন তাঁর ঘরে তাঁর বিনা অনুমতিতে তিনজন যুবককে ঢুকে পড়তে দেখে প্রথমেই হকচকিয়ে উঠলেন। পরমুহূর্তেই তাঁর নীল চোখ দু'টি যেন রাগে লাল হয়ে উঠল। তাঁর মুখ হতে কোন শব্দ বেরুবার আগেই তিন সাহসী যুবকের পিস্তল গর্জে উঠল। দেখতে দেখতে শয়তান সিম্প্‌সনের প্রাণহীন দেহ ঢলে পড়ল বীর নায়কদের সামনে।

মুহূর্তের মধ্যে এ খবর চলে গেল লালবাজারে। এখানেই ছিলেন কুখ্যাত টেগার্ট সাহেব। আর ইনি ছিলেন সেই সময়কার কলকাতার পুলিশ কমিশনার, আর ছিলেন পুলিশ আই. জি., এম. কেগ। এই টেগার্ট সাহেবকেই হত্যা করার

জন্য শহীদ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কাজেই স্বাধীনতাকামী বাঙ্গালীদের প্রতি এর কি ধরনের রাগ ছিল তা বুঝতেই পারা যাচ্ছে। যা হোক, শয়তান টেগার্ট ও আই. জি., এম. কেগ দানবের মত ছুটে এলেন সশস্ত্র গোরা পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঐ তিন যুবককে গ্রেফতার করার জন্য। টেগার্ট তাঁর সশস্ত্র দলবল নিয়ে পৌঁছে যেতেই শুরু হ'ল রাইটার্স বিল্ডিংসের বারান্দায় এক ছোটোখাটো সংগ্রাম। এক দিকে ভারতের মৃত্যুঞ্জয়ী তিন বীর নায়ক আর একদিকে অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদের সশস্ত্র গোরা পুলিশ বাহিনী। কি সাহস এই যুবকদের। মৃত্যু তাঁদের কাছে ছিল অতি তুচ্ছ। দু'পক্ষের গুলির শব্দে মুখর হয়ে উঠল কর্মচঞ্চল ডালহাউসী স্কোয়ার। হঠাৎ একটি গুলি দীনেশের বুকে এসে

বিঁধল। এদিকে তাঁদের গুলিও ফুরিয়ে এল। কিন্তু মৃত্যুর আগেও এই দুঃসাহসী যুবক হাসিমুখেই 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি তুললেন। ঐ ধ্বনি চিরকাল ধ্বনিত হবে কোটি কোটি দেশবাসীর হৃদয়ে।

এখানেই শেষ হল না। এবার তাঁরা কিছুটা অবদমিত বা হটে গেলেও হাল না ছেড়ে ঢুকে পড়লেন পাশেরই একটি ঘরে। ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলেন। অত্যাচারী ইংরেজদের হাতে মরতেও তাঁদের ঘৃণা বোধ হত। তাই তাঁরা কাছে রাখতেন পটাসিয়াম সায়ানাইড নামক এক প্রকার বিষ। কাজেই ইংরেজের হাতে মরা বা বন্দী হওয়ার চেয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যাকেই বেছে নিলেন এবং সঙ্গে নেওয়া বিষ খেয়ে ফেললেন। দেখতে দেখতে বাদল পরলোকে চলে গেলেন। যেন ভারতমাতার একটি মূল্যবান চোখের মণি খসে পড়ল।

এর পরেই বাকি দু'জন অর্থাৎ দীনেশ ও বিনয় নিজেদের পিস্তলে নিজ নিজ মস্তকে গুলি করে নীচে পড়ে গেলেন। কারণ পটাসিয়াম সায়ানাইডের শক্তিকে তাঁরা বিশ্বাস করতে পারলেন না, পাছে এতে মৃত্যু না হয়। যা হোক, বিষ তাঁদের পাকস্থলিতে ঢুকবার সুযোগ পেল না। তখন টেগার্ট দলবল নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছিলেন—তিন যুবককে গ্রেফ্তারের জন্য। কিছু সময় পরে তারা ঘরে ঢুকে পড়ল দরজা ভেঙে। ইংরেজ পুরুষেরা বঙ্গমাতার স্বাধীনতা যোদ্ধাদের অসাড় দেহ কয়টি বন্দী করল মাত্র। মুমূর্ষু, আহত দীনেশ ও বিনয়কে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠালো তারা। সেখানেই মৃত্যুবরণ করলেন বিনয় বোস।

সেও এক নিদারুণ অবস্থা। ঘৃণিত ইংরেজদের চিকিৎসায় বেঁচে ওঠার সাধ বাদল-এর

ছিল না। তাই তিনি মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলে ক্ষতস্থানে নিজের আঙুল ঢুকিয়ে দেন। ফলে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেই বঙ্গমাতার বীর সন্তানের জীবন-দীপ নিভে যায়।

বীরসেনা বাদলের মৃতদেহ পুলিশের হেফাজতে আই. বি. অফিসে পাঠান হয়েছিল। সেখানে সনাক্তকরণের পর পুলিশ হেফাজতে নিমতলা শ্মশানে পাঠিয়ে সৎকার করা হয়েছিল বীর বাদলের মরদেহ। বাকী রইলেন দীনেশ গুপ্ত। বিচারের জন্য বহু চেষ্টায় তাঁকে সুস্থ করে তোলা হল। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে এক বিশেষ বিচারে বীর স্বাধীনতা যোদ্ধা দীনেশের ফাঁসির হুকুম হয়। আপন জীবন যাঁর কাছে তুচ্ছ এ আদেশ তাঁর কাছে আরও নগণ্য। ফাঁসির আগে জেলখানা হতে দীনেশ তাঁর শ্রদ্ধেয়া বৌদিকে লিখে ছিলেন—"আমরা এক একজন

পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে পার্ট করিতে আসিয়াছি, পার্ট করা শেষ হইলে প্রয়োজন ফুরাইয়া যাইবে।"

১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই দীনেশের নশ্বর দেহকে ফাঁসি কাঠে ঝুলান হ'ল। দেখতে দেখতে তিনটি জীবন দীপ নিভে গেল বঙ্গমাতার মণিকোঠা হতে।

এইভাবে অবসান হল তিন বীর যুবকের জীবন নাটক। বেঁচে রইল তাঁদের মৃত্যুহীন প্রাণ। এই শহীদের মৃত আত্মার প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য পশ্চিমবাংলার কর্মকেন্দ্র ডালহোউসী স্কোয়ারের নাম রাখা হইল বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ।

—:—